অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল - বিপ্লবী বিমল নন্দী

লেখক: অরূপ চৌধুরী

ঝলমলে রোদ ঢালা এক পৌষের সকালে, ঢাকার বিখ্যাত Pogo's School, সামনে গোটাদশেক ছেলে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকলেরই গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর, পরণে ধুতি, আর পায়ে চামড়ার চটি। প্রায় দশটা নাগাদ স্কুলের ঘণ্টা পড়লো, সবে নতুন session শুরু হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র যে যার ক্লাসে ঢুকছে। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একটি ছাত্র দ্রুতপায়ে দশম শ্রেণীর ঘরটিতে ঢুকে গেল। ছোটবেলা থেকে এই স্কুলেরই ছাত্র, নতুন শ্রেণীতে এই প্রথম। বয়েসের তুলনায় সে একটু বেশিই লম্বা, বলিষ্ঠ, সুঠাম দেহের অধিকারী; মাথাভর্তি ঘন চুল একপাশে সিঁথি করা। লম্বা আদলের মুখ, বিশাল দুটি চোখ বড় অদ্ভুত, একই সঙ্গে প্রচণ্ড তেজ আর অবাক ভাবুকতায় ভরা – মনে হয় কোন অতল জগতের বাসিন্দা সে। শুরু হয় ক্লাস; roll call করার পর শিক্ষকমশাই সবে খাতা থেকে মুখটি তুলেছেন, ক্লাসের মাঝে ধ্বনি ওঠে, 'বন্দে মাতরম্'। সমবেত কণ্ঠে শোনা যায়, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিপাত যাক'। দৌড়ে আসে স্কুলের দারোয়ান, ছুটে আসেন সাহেব হেডমাস্টার। মুহূর্তে বদলে যায় শান্ত পরিবেশটি। সাহেবের চিৎকার, ছাত্রদের হইচই, তারই মাঝে খবর পেয়ে ছুটে গোরা পুলিশের দল। খাকি পোশাক, গোলাপী মুখের ইংরেজ অফিসার নিমেষে হুকুম জারী করেন 'Arrest! Let not a fly escape!' গণগ্রেফ্‌তারে আরো অনেকের সাথে গ্রেফ্‌তার হয় দশম শ্রেণীর সেই ছেলেটি। ধস্তাধস্তির মাঝে, পুলিশ ভ্যানে ওঠার সময় শোনা যায় তার উদ্দাত্ত গলায়, 'বলো, বন্দে মাতরম্, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিপাত যাক'। বাড়ীতে খবর যায় আইনজীবী পিতার কাছে, পাড়ায় খবর পৌঁছয় 'চুণীরে পুলিসে ধইরা লইয়্যা গেসে'। দিনটা ছিল ১৯৩২-এর ৬-ই জানুয়ারী। দীর্ঘাকৃতি যে পুরুষটিকে উত্তরকালে দেখা যেত দাপটের সঙ্গে মাইলের পর মাইল খালশিউলির লালমাটি রাস্তায় হেঁটে চলেছেন, দশম শ্রেণীতে ব্রিটিশ পুলিসের হাতে গ্রেফ্‌তার হওয়া সেই বিমল

নন্দীর বিপ্লবী জীবনের প্রথম অগ্নিশিখাটি সেদিন জ্বলে উঠেছিল পৌষের সকালে এক নিরীহ ক্লাসরুমের মাঝে।

বিমল নন্দী। ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দচন্দ্র নন্দী ও শ্রীমতি স্নেহলতার পরিবারে জন্ম ১৯১৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর, আদর করে সবাই ডাকে চুণী। পুর্বজা সুকুমারী, ও তিন জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা, নির্মলচন্দ্র, সুকোমল এবং অমলের কনিষ্ঠ বিমল নন্দী দশম শ্রেণীতে একদিন মাত্র ক্লাস করার পর গ্রেফ্‌তার হয়ে আড়াইমাস বিচারাধীন বন্দী হয়ে রয়ে গেলেন ঢাকা জেলে; সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ব্রিটিশ পুলিসের চোখে ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন, যে কারণে তাঁকে ছাড়তে পুলিসের খুবই আপত্তি ও অনাগ্রহ ছিল। সংগত কারণও ছিল; ১৯২৮ সালে, মাত্র ১৪ বছর বয়েসে বিমল নন্দী যোগদান করেছিলেন Bengal Volunteers বা B.V. –তে, তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়, প্রয়োজনও হয়নি। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নামের সঙ্গে ততদিনে B.V. নামটিও সকলের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। যতীন দাস ও সুভাষ সমগ্র ভারত জুড়ে দাবাগ্নির মত জ্বালাময়ী বক্তৃতা ছড়িয়ে দিয়েছেন, যার আঁচ প্রবলভাবে এসে লেগেছে পূর্ববঙ্গে। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা দলে দলে যোগ দিতে শুরু করেছে B.V.তে, কেউ গোপনে, কেউ বা প্রকাশ্যে। সমবয়সীদের সাথে বিমল নন্দীও কখন ঢুকে পড়েছেন, খেয়াল হয়নি। সে দিনগুলির কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন, ‘তখন তো আমাদের মাথায় কি ভাবে দেশ স্বাধীন হবে, এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা বা ambition ছিলনা’। B.V.র তখন ছিল দুটি শাখা, open wing ও secret wing; ধীরে ধীরে বিমল নন্দী হয়ে উঠলেন secret wing-এর এক গুরুত্বপুর্ণ সদস্য। তাই একবার হাতে পাওয়ার পরে, আড়াই মাস বিচারাধীন বন্দী রেখে পুলিস তাঁকে পাঠিয়ে দিল হিজলী detention camp-এ (যেখানে এখন IIT খড়্‌গপুর বিদ্যমান) detainee হিসেবে। বিমল নন্দীর সেই প্রথম কলকাতা দেখা, অবশ্য prison van থেকে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই। খড়্‌গপুর হয়ে তিনি চলে গেলেন হিজলীতে, সেখানে অন্তরীন থাকাকালীনই ১৯৩৩-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের

সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল B.V.র কাজকর্ম, অবশ্যই অত্যন্ত গোপনে। তাঁকে সামলাতে নাজেহাল ব্রিটিশ প্রশাসন আরও কড়াকড়ি করলো তাঁর সাধারণ চলাফেরার ওপর। বাতিল করা হোল তাঁর মুক্তির সমস্ত সম্ভাবনা। সেই অন্তরীন অবস্থাতেই দুই বছর বাদে ১৯৩৫ সালে বিমল নন্দী সসন্মানে উত্তীর্ণ হলেন intermediate পরীক্ষায়। ততদিনে তাঁর B.V. সংক্রান্ত কাজকর্ম এমন বিশাল আকার ধারণ করেছে যে প্রশাসন আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজী হোলনা। হিজলীতে তিনি যে কাজকর্মের নিখুঁত জাল বুনেছিলেন, তা ছিন্ন করতে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোল মীরপুরে, এবং পরে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়ায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে তাঁকে থাকতে হয় ১৯৩৬ থেকে দুই বছর। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁর কাজকর্মের গতিরোধ করতে পারলেও মস্তিষ্কের প্রসারণকে প্রতিহত করতে পারলনা। অন্তরীন অবস্থাতেই ১৯৩৭ সালে বিমল নন্দী কৃষ্ণনগর কলেজের Detainee Student হিসেবে B.A. পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন দর্শন ও অর্থনীতি নিয়ে, এবং এবারও বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে। ছয় বছর অন্তরীন থাকার পর ১৯৩৮ সালের শেষার্ধে বিমল নন্দী মুক্তিলাভ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে আরো ব্যাপক ভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন B.V.-র কাজকর্মের সঙ্গে, এবার সুভাষচন্দ্রের আরো প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে, কখনো বা শরৎচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে। পরের বছর ১৯৩৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে M.A. পরীক্ষায় বসলেন, কিন্তু অসম্পূর্ণ রইল সে পরীক্ষা, কারণ ইতিমধ্যে দেশে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। পুরোমাত্রায় রাজনীতিতে নেমে পড়লেন বিমল নন্দী, এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ১৯৪০-এর ১৩ই এপ্রিল কারারুদ্ধ হলেন B.V.র ২২ জন সদস্যের সঙ্গে – তাদের রাখা হোল প্রেসিডেন্সী জেলের ১৮ নম্বর সেলে।

সে বছরই জুন মাস নাগাদ হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে সুভাষ আন্দোলনের ঝড় তুললেন, আর ১৯৪০-এর জুলাই-এর শুরুতে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে পুলিস ওই প্রেসিডেন্সী জেলের ১৮ নম্বর সেলেই বন্দী করে রাখে। সেখানে বিমল নন্দী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একটা বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

পাশাপাশি দুটি খাটে তাঁদের বিছানা ছিল, আর রাতের পর রাত সুভাষ শোনাতেন তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্নের কথা, বহু পরিকল্পনা, বহু আলোচনা, বহু ভবিষ্যত কর্মসূচী। বন্দীদশার ওই সময়টাই তাঁর জীবনের সেরা সময় বলে বিমল নন্দী গর্ববোধ করতেন। কিন্তু, কিছু অভিমান, কিছু তাঁর রাজনৈতিক গুরুর প্রতি বিশ্বস্তার কারণে, বিমল নন্দী সেই সময় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়ে সম্পুর্ণ নীরব থাকতে ভালোবাসতেন। সুভাষের সঙ্গে বিমল নন্দীর সেই শেষ দেখা, কারণ এর কিছুদিন পরেই পুলিস সুভাষচন্দ্র কে European ward-এ স্থানান্তরিত করে। প্রেসীডেন্সী জেলে সুভাষ তুমুল আন্দোলন করে শুরু করলেন দুর্গাপূজার প্রচলন, সেই সঙ্গে দাবী তুললেন, ‘বিচার করো, নয়ত ছাড়ো’।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৬, ছয় বছর কারান্তরালে ছিলেন বিমল নন্দী। পুলিসের খাতায় উল্লেখ তাঁর ‘highly dangerous person’ বলে, তাই ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁকে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে সাহস পায়নি; প্রেসীডেন্সী থেকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল, তৎপরে আবার হিজলী, সেখান থেকে বক্সা জেল, এবং পরিশেষে নিয়ে আসা হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। এরই মাঝে ১৯৪৪-এ বক্সা detention camp-এ থাকাকালীন ১৯৩৯-এর অসম্পূর্ণ M.A. পরীক্ষায় বসলেন বাংলা নিয়ে, এবং উত্তীর্ণ হলেন। কারাবাসের শেষ দিকে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি কারামুক্তির পরে বিমল নন্দী প্রথম গেলেন ঢাকায়, পরে তাঁর পিতৃকুলের আদি নিবাস কুমিল্লায়, এবং ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

কিন্তু নতুন ভারতে বিমল নন্দী দেখলেন এক অবর্ণনীয় দুরবস্থার চিত্র। ১৯৫০ থেকে বছর দুয়েক মেদিনীপুরের খালশিউলি গ্রামে বাস করার সময় তিনি স্থির করেন যে গ্রামে শিক্ষার প্রসারে উৎসর্গ করবেন যা কিছু সম্বল আছে। কিন্তু বিপ্লবীর সম্বল একখানা ঝোলা, দুখানা ধুতি, দুটি শাদা শার্ট আর একজোড়া চটি ছাড়া আর কিছু সম্যক না পেয়ে স্থির করলেন উপার্জন করতে হবে। শুরু হোল শিক্ষকতার জীবন, বিষয় বাংলা। ১৯৫৭ থেকে

১৯৬২ পর্যন্ত কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে St. Joseph’s College-এ এবং তৎপরে ১৯৬৫ পর্যন্ত কার্শিয়াংএর Gokhale’s Memorial School-এ পড়িয়ে বিমল নন্দী যোগ দিলেন আসানসোল-এর St. Patrick’s High School-এ, এবং সেখানেই শিক্ষক জীবন সমাপ্ত করলেন ১৯৮২ সালের শেষে। এই ২৫ বছরের কর্মজীবনে তাঁর যা কিছু উপার্জন, সম্বল হয়েছিল, সমস্ত কিছুকে পূর্ব পরিকল্পনা মতো উৎসর্গ করে দিলেন খালশিউলি গ্রামের উদ্দেশ্যে, এবং ১৯৮৫-তে বাসগৃহ নির্মাণ করে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

যে কৃষক পরিবার ভালবেসে তাঁকে প্রথম সেই গ্রামে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের সাহায্য ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বিমল নন্দী গড়ে তুললেন খালশিউলি Boys’ High School। গ্রামে প্রচলন করলেন এক অভিনব দুর্গাপূজার; অভিনবত্ব পূজায় ছিলনা, ছিল তার উদ্যোগ আয়োজনে। উদ্যোক্তা হিসেবে বিমল নন্দী ডেকে আনলেন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষজনকে। নিচু জাত বলে এতদিন যারা ছিল ব্রাত্য, দূর থেকে প্রতিমা দেখা ছাড়া যাদের অন্য অধিকার ছিলনা, তাদেরকে তিনি ডেকে আনলেন দেবীর ফুল সাজাতে, ভোগ রাঁধতে, প্রসাদ বিতরণ করতে। সেই অশ্রুতপূর্ব প্রয়াসকে কিন্তু পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের সমাজ একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁর এই পরিকল্পনার আঁচ পেয়ে গ্রামের উচ্চবর্ণের মানুষরা, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সকল ব্যক্তিত্ব, বিমল নন্দীর আয়োজনে খালশিউলি স্কুলের দুর্গাপূজা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাঝির হাতে পরিবেশিত প্রসাদ খেলে ‘অনন্ত নরকবাস’ হবে এমন কথাও গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হোল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্যর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই ফুল, বেলপাতায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে, এমন অনাচার সহ্য করা হবেনা বলে ঘোষণা করাও হোল। বিমল নন্দীর সামনে উপস্থিত হল এক গভীর সামাজিক সমস্যা। কিন্তু বিপ্লবী মানুষ তিনি, সহজে হার মানেন না। অসাধারণ সাহস এবং নিজের আদর্শের প্রতি সততাকে সম্বল করে তিনি তাঁর পূর্বপরিকল্পনায় অটল রইলেন। বহু বাধা এল, এমনকি প্রাণনাশের আশংকা দেখা দিল, তাতে সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আরো প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ালেন তিনি।

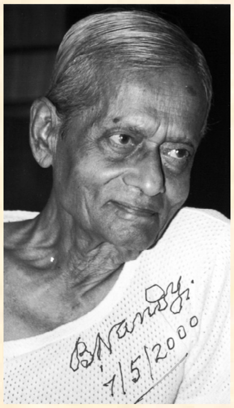

অবস্থা যখন চরমে উঠল, বিমল নন্দী গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের ডেকে জানিয়ে দিলেন, যদি একটি নিম্নবর্গের মানুষকেও পূজাস্থানে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়, অথবা যদি নেতাদের প্ররোচনায় সাধারণ গ্রামবাসীরা পূজায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বিনা দ্বিধায় দুর্গাপ্রতিমা পরেরদিন কংসাবতীর জলে ভাসিয়ে দেবেন তিনি, এর ফলে গ্রামের যদি কোন অকল্যাণ হয় তো হোক। সে দিনগুলির কথা স্মরণ করে বিমল নন্দী পরে বলেছেন, ‘সেদিন বুঝেছিলাম গোঁড়ামি আর কুসংস্কার আমাদের কত বড় শত্রু – তাই একে বধ করার জন্য কুসংস্কার দিয়েই কুসংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছিলাম’। তাঁর এই কথায় সমস্ত গ্রামে যেন বজ্রপাত হোল। দশমীর আগেই দেবীর বিসর্জন! অকল্যাণের ভয়ে নীরবে সবাই চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হোল, সার্থক হোল বিমল নন্দীর স্বপ্ন। মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে শুরু হোল এক নতুন অধ্যায়ের। তারপর থেকে আরো ঝড়ের মুখে সমান সাহসিকতায় রুখে দাঁড়িয়েছেন বিমল নন্দী, এবং সর্বত্র জয় হয়েছে তাঁরই।

খালশিউলির মহাবিদ্যালয় আজ আরও বড় হয়েছে – আয়তনে ও খ্যাতিতে। বিমল নন্দী অবসর নিয়েছেন অনেক আগেই, কিন্তু অবসর কি তাঁর মেলে? গ্রামের যে কোন সমস্যায় তাঁর প্রিয় গ্রামবাসীরা এসে হাজির হতেন এই অকৃতদার মানুষটির কাছে। কারও কাছে তিনি ‘বাবা’, কারও ‘দাদা’, কেউ ডাকত ‘দাদু’ বলে, আর সর্বসাধারণের কাছে তিনি ‘মাস্টারমশাই’। খড়্গপুর থেকে বম্বে রোড ধরে মানিকপাড়ার দিকে যত অগ্রসর হওয়া যেত, পথের ধারে কোন গ্রামবাসীকে ‘মাস্টারমশাই-এর বাড়ি’ জানতে চাইলেই তিনি সসম্ভ্রমে দেখিয়ে দিতেন বিমল নন্দীর সাদামাটা একতলা বাড়িখানা। যাওয়ার পথেই হয়ত দেখা যেত, ধুতি ও সাদা শার্ট পরণে, ছ’ফুট দু’ইঞ্চির শক্তপোক্ত দীর্ঘশরীর নিয়ে মাথার রুপোলি চুলকে অগ্রাহ্য করে একটি মানুষ আপনমনে চলেছেন, পায়েহেঁটে। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারীর শুরুতে কালের অমোঘ নিয়মে ৮৯ বছরের এই তরুণ কর্মবীর কলকাতার S.S.K.M. হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

করেন। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শুরু করে খালশিউলির প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে, আজও মিশে আছেন কিম্বদন্তী পুরুষ বিমল নন্দী।

__লেখক পরিচিতিঃ__ অরূপ চৌধুরী। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পক্ষীবিজ্ঞানের ছাত্র, পরবর্তীকালে পেশায় শিক্ষকতা। মামাবাড়ি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলার সেনবাড়িতে। ঢাকার ওয়াড়ি (wari) তে মাতামহ সুধেন্দুমোহন দাশগুপ্তের ১১নং নবাব স্ট্রীটের বাড়িখানা ছিল বিপ্লবীদের পরমাশ্রয় ও আড্ডাস্থল। বিমল নন্দী দাশগুপ্ত পরিবারের প্রতিবেশী হলেও তাঁর বড় হয়ে ওঠার অনেকটাই এই ১১নং বাড়িতে, তাই সে পরিবারে তিনি ‘বড় ছেলে’-র মর্যাদা পেয়েছেন। সে সূত্রে লেখকের তিনি, মামা।